প্রসঙ্গঃ বৈশাখী মেলা ও মহুয়া হক

জয়নাল আবেদীন

প্রতিযোগীতা সব সময়ই ভাল। সুস্থ হলে বেশী ভাল, সুস্থ না হলেও মনে হয় খারাপ না। কথাটা বার বারই মাথার মধ্যে ঘুরে ফিরে আসছিলো এবারের অলিম্পিক পার্কের বৈশাখী মেলায় গিয়ে।

বিশাল ভেন্যুতে বিরাট ও সুন্দর আয়োজন। প্রবাসী পরিবেশে দেশীয় সংস্কৃতির সফল ও অনবদ্য উপস্থাপনা মনের দেয়ালে ভাল লাগার অদ্ভুত এক পরশ লাগায়। শরতের চমৎকার বিকেল, স্বর্ণালী সন্ধ্যা। রকমারী শাড়ীতে ও সাজে অনবগুণ্ঠিতা বঙ্গ ললনার স্বচ্ছন্দ ও উচ্ছ্বল পদচারণা মুখর বিস্তির্ণ প্রান্তর, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের মিষ্টি মুখের হাসি, দুরন্ত ছুটোছুটি, প্রজাপতির মতো উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বল তরুণ-তরুণীদের অকারণ চঞ্চলতা, দোকানে দোকানে রসনাসিক্তকারী রকমারী বাঙালী খাবারের সুঘ্রান ও সযত্ন উপস্থিতি, গ্রামীণসহ বিবিধ বিপনি বিতানে বাঙালী পোষাকের সম্ভার, বিরাট মঞ্চ আর সুবিশাল গ্যালারী নিয়ে সারাদিনের সাংস্কৃতিক ডালি, উন্মুক্ত প্রান্তর, ঘন সবুজ ঘাস, মনকে ভাল করে দেয়ার মতো চমৎকার একটা পরিবেশ। 'মেলা থেকে তাল পাতার এক বাঁশী'-কিনে যে বাঙালী চিত্ত হয় ব্যাকুলিত, তার কাছে এই মেলার আবেদন ও আস্বাদন কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। এমন সফল ও সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের যারা আয়োজক, সংগঠক, তারা নিঃসন্দেহে বড় ধরনের প্রশংসার দাবীদার।

প্রতিযোগীতা সব সময়ই মানুষকে এগিয়ে নেয়। ভিন্ন মাত্রা, অতিরিক্ত উৎকর্ষতা যোগ হয় তার পার্থিব ও অপার্থিব কর্মকান্ডে। এটা মনে হয় সর্বৈব সত্য। খেলায়, রাজনীতিতে, সামাজিক কর্মকান্ডে, শিক্ষায়, বানিজ্যসহ জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিযোগীতার উপরইতো নির্ভর করে মানের যথাযথ অবস্থান। প্রতিযোগীতাটা যখন সুস্থ থাকে তখন তা সুন্দরের প্রতিচ্ছবি, আকর্ষণীয়, প্রশংসনীয়। অসুস্থ প্রতিযোগীতা অসুন্দর, কামনীয়ও নয় সত্য, তারপরেও মজার ব্যাপার হলো তাতে মানের উন্নয়নের গতিধারা স্তব্ধ হয় না মোটেই। তা এগিয়ে চলে। প্রতিযোগীতা যত তীব্র হয়, তার এগিয়ে যাওয়ার গতিপথ হয় তত দ্রুত। অলিম্পিক পার্কের সবুজ মখমলের মতো ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে জীবনের এই বোধকে আর ও নিশ্চিত সত্য বলেই সেদিন মনে হলো।

সিডনীর বঙ্গবন্ধু পরিষদ আজ তিন ভাগে বিভক্ত। যে বিষয় নিয়ে, যে সব কারণে এই বিভক্তি, তার যথার্থ যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তার একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই সব দলেরই আছে। বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের কাছে এই বিভক্তি অমনঃপূত, অবাঞ্ছিত হলেও তাতে নেতৃত্বের নিশ্চয়ই কিছু যায় আসে না । সেদিন অলিম্পিক পার্কের বিস্তির্ণ মাঠের বিশাল জনগোষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জনৈক বন্ধু দুঃখ করে বলে, আহা, তিনটা বঙ্গবন্ধু পরিষদ যদি একসাথে আজ....। বন্ধুর কথাটা আর শেষ হয় না। মাঝ পথে থেমে যায় সে।

একতাই বল। তিনটা বঙ্গবন্ধু পরিষদ একসাথে থাকলে সুন্দর হতো নিশ্চয়ই, কাম্যও ছিল সেটাই। শুধু আওয়ামী অনুসারী নয়, যে কোন বঙ্গবন্ধু প্রেমিকের কাছে সেটাই ছিল চরম অভিপ্রেত। কিন্তু সেই সাথে একটা প্রশ্ন হয়তো থেকেই যেত। তিনটা বঙ্গবন্ধু পরিষদ একসাথে হলে তার শক্তি-সামর্থ আরও অনেক বেশী হতো, সন্দেহ নেই তাতে। অলিম্পিক পার্ক কেন, আরও অনেক বড় কোন জায়গায়, তিনগুন বিশালতায় হয়তো অনুষ্ঠান করা সম্ভব হতো। কিন্তু সত্যিই কি হতো? হয়তো হতো, হওয়া সম্ভব ছিল। সেই সাথে কিছুটা সন্দেহ ও ছিল।

কি হতো, কি হতে পারতো, সেই জল্পনা-কল্পনা যদি দূরেও রাখি, তারপরেও নির্দ্বিধায় যেটা বলা যায়, অলিম্পিক পার্কের এবারের বৈশাখী মেলা ছিল এক কথায় সার্থক, সফল। এ যাবৎকালের বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্বোবৃহৎ আয়োজন। লোক সংখ্যার দিক দিয়েতো বটেই, উপস্থাপনাতেও কম নয়। এমন

একটা অনুষ্ঠানে মহুয়া হক ও তাঁর গানের দল নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে সেটা নিতান্তই দুঃখজনক, লজ্জাষ্কর। দর্শক-শ্রোতার আসন থেকে অবলোকনেই বুকে কষ্ট জমে উঠে। মহুয়া হকের সেদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার আর্তনাদ তাই অতি সহজেই ইন্টারনেটের পাতা থেকে উঠে এসে অনুভূতিতে আঘাত হানে।

বৈশাখী মেলার সেদিনের ঘটনা এবং তৎপরবর্তী 'বাংলা-সিডনী'-তে মহুয়া হকের লেখাটা ছাপার পর জনৈক বন্ধুর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ হচ্ছিল। তার মতে, ডঃ রাজ্জাক ও শেখ শামীমকে বার বার ফোন করেও যখন পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন তাঁর (মহুয়া হকের) বুঝে নেয়া উচিৎ ছিল, দিন বদলে গেছে। কথাটায় যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। মহুয়া হকের জায়গায় উজ্জ্বল হক হলে তিনি যে মুহূর্তেই সেটা বুঝে যেতেন, সে ব্যাপারে আমি ১০০ ভাগ নিশ্চিত। কিন্তু মহুয়া হকতো আর উজ্জ্বল হক নয়। অন্য আর ও অনেকের মতো মহুয়া হক বৈশাখী মেলায় তাঁর দলবল নিয়ে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন। মিসেস হকের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ঐ দাবী ন্যায্য ছিল কি না তা নির্ধারণ ও অনুমোদনের ভার নিঃসন্দেহে কর্তৃপক্ষের কিন্তু তাঁকে নিবৃত করার যে পন্থা সেটা ছিল অসুন্দর, অশালীন।

বৈশাখী মেলার পরের দিন ডঃ চৌধুরীর কিংস ল্যাংলীর বাসায় বাংলাদেশ থেকে আগত পল্লীগীতি শিল্পী রবিন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ কাউয়ুম পারভেজের সাথে সিডনীর বৈশাখী মেলার প্রতিষ্ঠাতা জনাব উজ্জ্বল হক

মিসেস হকের 'বৈশাখী মেলা ঃ একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা' লেখাটি বাংলা-সিডনী ডট কম-এ ছাপার পর জনৈক 'অনামিকা-১' পাঠকের প্রতিক্রিয়া পড়ে কিছুটা বিস্মিত হয়েছি। তিনি লিখেছেন *'I am DISAPPOINTED by her response… the youth of Sydney ceraintly expects more from our elders.. more understanding, more respect for one another… more caring and loving attitude towards the youth….'* বুঝে উঠতে পারছিনা, যুবকদের প্রতি আরও অধিক যত্ন ও ভালবাসা প্রদর্শনে মিসেস হকের ঠিক কি করা উচিৎ ছিল? নিজের বেদনার বহিঃপ্রকাশ, প্রতিবাদ প্রদর্শনের দুঃসাহস না দেখিয়ে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে সিডনী থেকে সদলবলে অন্য কোন শহরে গিয়ে কি তাঁর বসবাস করা উচিৎ ছিল? নাকি গান চলাকালীন সময়ে মাইকের সুইচ বন্ধ ও ষ্টেজ থেকে শিল্পীদের জোর করে নামিয়ে দিতে ফয়সলকে যে

কষ্ট করতে হয়েছে তার জন্য করজোড়ে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ ছিল? অনামিকা-১ আর ও লিখেছেন, *ÔShe should have spoken to Dr Razzaq and BBP in private to express her disgust, which she is entitled to.'* যাকে হাজার মানুষের সামনে *publicly* অপমান করা হলো, *She does not have the entitlement to speak that in public.* বেশ *interesting* না ব্যাপারটা?

তিনি আরও লিখেছেন, *মিসেস হকের জানা উচিৎ ছিল, কত কষ্ট, কত বিনিদ্র রজনী গেছে ঐ বেচারার। কত অবহেলা তার করতে হয়েছে পরিবার ও ভালবাসার জনদের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করতে.....।* এই মেলার প্রতিষ্ঠাতা উজ্জ্বল হক ছিলেন মহুয়া হকের স্বামী এবং অবহেলায় ফয়সলের পরিবারের মতো তিনি নিজেও সমান ভুক্তভোগী বলে আমার বিশ্বাস। মিসেস হকের খুব ভাল করেই জানার কথা কত শ্রম, কত সময় দিতে হয় একটা অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে। শুধু এর বিনিময়ে কাউকে এভাবে অপমান করার অধিকারও যে অর্জন করা যায়, সেইটুকুই হয়তো তাঁর জানা ছিল না । সেটা জানা থাকলে হয়তো ভাল হতো। ভালহতো তাঁর নিজের জন্যে, ভাল হতো আর সবারও ।

আশাহতের ব্যাপার, সিডনীতে আজ এতগুলো কমিউনিটি পত্র-পত্রিকা, ওয়েব সাইট। কোথাও এ ব্যাপারে খুব একটা প্রতিবাদ বা সমালোচনা চোখে পড়লো না। নিজের বুকের ব্যাথা লাঘব করতে শেষ পর্যন্ত মহুয়া হকের নিজেকেই এগিয়ে আসতে হলো । ভাগ্যিস তাঁর লেখার হাত ছিল। এ ব্যাপারে কতিপয় সুধিজনের সাথে কথা বলে যেটা বুঝতে পারি, কমিউনিটি পত্র-পত্রিকার সাথে যারা জড়িত তাঁরা বেশীর ভাগেই করে সেটা সখের বশে। ঝামেলায় জড়াতে চায় না কেউ। কারও কারও আবার বড় বড় সব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হওয়ার, বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন আছে। সমালোচনায় সমস্যা হয়। কমিউনিটির সাধারণ সদস্য হিসেবে জানতে ইচ্ছা করে, এই সমস্ত পত্র-পত্রিকা,ওয়েব সাইটের কাছে কমিউনিটির চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্খার পরিধি আসলে কতটা হওয়া উচিৎ? কমিউনিটির আমরা যারা সাধারণ সদস্য তাদেরতো জানতে ইচ্ছা করে, কমিউনিটির কোথায় কি হচ্ছে? কমিউনিটি কর্মকান্ডের উপস্থাপনায় ভালর জন্য যেমন প্রশংসা থাকবে, তেমনি খারাপ বা অসুন্দরের সমালোচনা হবে, সেটাইতো সঙ্গত। সমালোচনা যদি হয় সংশোধনের নিমিত্তে পরিচালিত, উদ্দ্যেশে যদি কাউকে ছোট করার অভিপ্রায় থাকে অনুপস্থিত, তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

নির্দ্বিধায় বলা যায়, শুধু বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন, যে কোন সংগঠনের জন্য ফয়সালের মতো প্রতিভাধর ছেলেরা এক একটা গর্ব। তাদের কর্মকান্ডের কোথাও যদি সত্যিকার কোন দূর্বলতা থাকে তবে তা দেখিয়ে দেয়ার দায়িত্বটুক তো কাউকে না কাউকে নিতেই হবে। সেই সাথে আর একটা প্রশ্নও তো থেকেই যায়। সেদিনের সেই ঘটনায় ফয়সালের সত্যিকার ভূমিকা আসলে কতটুকু? উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তিনিই কি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, নাকি সিদ্ধান্ত পালনকারী মাত্র? উত্তরটা যাই হোক না কেন তাতে মহুয়া হকের বেদনার মাত্রার কোন হেরফের হয় না সত্য তবে ফয়সালকে বুঝতে হয়তো কিছুটা সহজ হয়।

বৈশাখী মেলার সেদিনের অনুষ্ঠানের ঐ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির বিশেষ মুহুর্তটি বাদ দিলে এটা একটা চরম সফল অনুষ্ঠান। এই সফলতা ও কৃতিত্বের প্রথম ও প্রধান ভাগিদার পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং তার মাধ্যমে আয়োজক কমিটির সকলেই। ঠিক একই ভাবে এর দায়ভার ও মনে হয় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে প্রধানতঃ প্রেসিডেন্টের উপরই এসে বর্তায়। এমন একটা সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে পরিষদ প্রেসিডেন্টের নিরব ও নিশ্চুপ অবস্থান আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু পরিষদ(রা-শা)-এর প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজ্জাক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। অন্ততঃ আমারতো তাই ধারণা। বঙ্গবন্ধু পরিষদের নীতি নির্ধারণী ও একাধিক সংকটময় মুহুর্তে তাঁর অবস্থান নিয়ে যে

জনশ্রুতি, তা আমার দৃষ্টিতে তাঁকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, মননশীল এবং বিচক্ষণ বলেই প্রতিষ্ঠিত করে। বৈশাখী মেলার সেদিনের সেই অপ্রীতিকর ঘটনা এবং পরবর্তীতে মহুয়া হকের লেখা পড়ে আমার কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল, ডঃ রাজ্জাক হয়তো ঐ দুঃখজনক মুহূর্তের জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন, হয়তো ক্ষমা চাইবেন। কিন্ত না, তিনি কিছুই করেননি। তিনি নীরব, পুরোপুরি নিশ্চুপ। ডঃ রাজ্জাক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মানুষ। তিনি যেটা করেছেন সেটাই হয়তো সঙ্গত ? কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয়, ঐ দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর মহুয়া হকের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ ছিল। আমার বিশ্বাস, এই ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি ছোট হতেন না কারো কাছেই। নিজের মননশীল মনের পরিচয়ে হয়তো আরও অনেক বড়ই হয়ে যেতেন আমার মতো বেশ কিছু সাধারণ মানুষের কাছে।

জয়নাল আবেদীন, ১৪ জুন, ২০০৭, সিডনী।

Send your comment to : jabedin@aapt.net.au

লেখকের জ্ঞানগর্ভ পুর্বের লেখাগুলো পড়তে এই চৌহদ্দীতে টোকা মারুন